

## খেলাপি ঋণে শীর্ষে বাংলাদেশ, দায় কার?

ধরা যাক, একটি বাড়ির দেয়ালে বছরের পর বছর ধরে ফাটল ধরেছে। বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। কারণ, ফাটলের ওপর বারবার রং করা হয়েছে, কোথাও প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একদিন নতুন মালিক এসে পুরনো রং তুলে দেওয়াল পরীক্ষা করলেন। তখন একসঙ্গে বেরিয়ে এলো অসংখ্য ফাটল। এখন প্রশ্ন হলো—এই ফাটলগুলো কি নতুন মালিক তৈরি করেছেন?

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের বর্তমান চিত্র অনেকটা এমনই। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ এখন ৬ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে—২০২৬ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। মার্চ শেষে এই হার ছিল ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ। সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু এই খেলাপি ঋণের পাহাড় বর্তমান বিএনপি সরকারের সময়ে তৈরি হয়েছে—এমন দাবি করার কোনো সুযোগ নেই। খেলাপি ঋণ এক দিনে তৈরি হয় না। আজ যে ঋণটি খেলাপি হিসেবে হিসাবের খাতায় উঠছে, সেটি হয়তো বহু বছর আগে বিতরণ করা হয়েছিল। বছরের পর বছর কিস্তি পরিশোধ না করলেও নানা সুবিধায় ঋণ পুনঃতপশিল করা হয়েছে, পরিশোধের জন্য বাড়তি সময় দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঋণ শ্রেণীকরণের নিয়ম কঠোর হলে সেই ঋণের প্রকৃত চেহারা হিসাবের খাতায় ধরা পড়েছে। এখানেই বর্তমান খেলাপি ঋণের হিসাব বোঝার মূল বিষয়টি।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। ২০০৯ সালে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল প্রায় ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের জুনে খেলাপি ঋণ হয় ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকায়। মাত্র তিন মাসে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা বেড়ে যাওয়ার এই হিসাব

দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—তিন মাসে কি এত বিপুল অঙ্কের নতুন খেলাপি হয়ে গেল? বাস্তবতা তা বলে না। ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ঋণ শ্রেণীকরণের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসে। ২০১৯ সালে ঋণকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে শিথিলতা আনা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। ফলে এত দিন যেসব ঋণ নানা কারণে খেলাপি হিসেবে হিসাবের বাইরে ছিল, সেগুলোর বড় অংশ নতুন করে শ্রেণীকৃত হয়।

আইএমএফও বলেছে—২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে খেলাপি ঋণ দ্রুত বেড়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ ছিল দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা খেলাপি ঋণ প্রকাশ্যে আসা। সংস্থাটির হিসাবে, ২০২৪ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণের অনুপাত ছিল ১২ দশমিক ৬ শতাংশ। ডিসেম্বরে গিয়ে তা বেড়ে ২০ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছে। ২০২৫ সালের মার্চে তা প্রায় ২৪ শতাংশে পৌঁছায়। অর্থাৎ, খেলাপি ঋণের এই বিপুল অঙ্ক হঠাৎ তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা সমস্যার বড় অংশ তখন প্রকাশ্যে আসে। দীর্ঘদিন কার্পেট সরানোর কাজ শুরু হয়েছিল তখনই। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারও পরবর্তী সময়ে সেই প্রকৃত চিত্র আড়াল না করে প্রকাশ্যে রাখার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের বাকি অংশ (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কলাম) নিচে ইউনিকোডে দেওয়া হলো:

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার একটি বক্তব্যও প্রশ্নের জন্ম দেয়। তিনি বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করবে না, সেটা হতে পারে না।’

কথাটি রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে চটকদার হতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ খেলাপি ঋণ কোনো সরকারের ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় না; এটি বছরের পর বছর ধরে জমে ওঠা ঋণ-অনিয়ম, দুর্বল তদারকি, পুনঃতপশিল, ঋণ পুনর্গঠন এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতার ফল।

পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তারা বড় অঙ্কের ঋণ পেয়েছেন। এসব ঋণের বড় অংশ পরিশোধ হয়নি। অথচ খেলাপি হওয়ার পরও নানা সুবিধা দিয়ে অনেক ঋণকে দীর্ঘদিন হিসাবের খাতায় সচল রাখা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের হিসাবের খাতায় অনেক সময় বাস্তবতার চেয়ে ভালো একটি চিত্র দেখানো হয়েছে। একটি ঋণ কাগজে খেলাপি নয়—এর অর্থ এই নয় যে ঋণটি বাস্তবেও সুস্থ অবস্থায় রয়েছে। বহু ঋণ পুনঃতপশিল করা হয়েছে, পরিশোধের সময় বাড়ানো হয়েছে, নতুন সুবিধা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মূল ঋণ পরিশোধ হয়নি। এভাবেই প্রকৃত খেলাপি ঋণের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন হিসাবের আড়ালে রাখা হয়েছে।

আইএমএফের বিভিন্ন প্রতিবেদনেও ব্যাংক খাতের দুর্বল সুশাসন, দুর্বল তদারকি, শিথিল নিয়ন্ত্রণ এবং বড় ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের দুর্বল সংস্কৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পুনঃতপশিল ও পুনর্গঠিত ঋণ বিবেচনায় নিলে প্রকৃত সমস্যার আকার ঘোষিত খেলাপি ঋণের চেয়েও বড় হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হলো—আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ব্যাংক খাতে যে অনিয়ম ও ঋণ লুটপাট হয়েছে, তার দায় বর্তমান বিএনপি সরকারের ওপর আসবে কেন?

আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। খেলাপি ঋণের অনেক ঋণগ্রহীতা দীর্ঘদিন ধরে ঋণ পরিশোধ করেননি। কেউ কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। বছরের পর বছর আসল অর্থ পরিশোধ না হওয়ার কারণে সুদের আসল ও অন্যান্য দায় যুক্ত হয়েছে। ফলে পুরোনো ঋণের অঙ্কও সময়ের সঙ্গে বেড়েছে। এই বাস্তবতায় বর্তমান সময়ে খেলাপি ঋণের যে অঙ্ক বাড়ছে, সেটি বর্তমান সরকারের সময়ে বিতরণকৃত ঋণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এমনটি বলারও সুযোগ নেই। তবে এখন বর্তমান সরকারের দায়িত্ব হলো—খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ্যে আসার পর সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো তা আদায় করা এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের সংকট যাতে আর তৈরি না হয়, সেই ব্যবস্থা করা।

কারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হয়েছেন আর কারা প্রকৃত ব্যবসায়িক সমস্যার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি—তা আলাদা করতে হবে। ঋণ জালিয়াতি ও

ব্যাংক লুটপাটের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী মহল যাতে ব্যাংককে নিজেদের অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ শুধু খেলাপি ঋণের প্রকৃত অঙ্ক প্রকাশ্যে আনাই সমস্যার সমাধান নয়। প্রকৃত সংস্কার তখনই হবে, যখন সেই অর্থ উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং একই ধরনের অনিয়মের পথ বন্ধ করা যাবে।

দেয়ালের ফাটল আজ দেখা যাচ্ছে বলে ফাটল আজ তৈরি হয়েছে—এমন নয়। বহু বছরের পুরোনো ক্ষত এবার প্রকাশ্যে এসেছে। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষতও সতটাই একই। এখন প্রয়োজন সেই পুরোনো ক্ষত আবর্জনা ঢেকে রাখা নয়; ক্ষত কোথায় এবং কতটা গভীর—তা স্বীকার করে স্থায়ীভাবে তার চিকিৎসা করা। কারণ, কার্পেট সরানো হয়েছে বলেই এখন ধুলো দেখা যাচ্ছে। সেই ধুলো আবার কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখার সময় নয়; বরং ধুলো পরিষ্কার করে ব্যাংক খাতকে সুস্থ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময়।

**এস এম রশিদুল ইসলাম**

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)